পল্লী উন্নয়নে আইসিটির ব্যবহার কি আদৌ হচ্ছে?

আবীর হাসান

আসলে রাজনৈতিকভাবে যা বলা হচ্ছে, তা অতিকথন বৈ কিছু নয়। বাংলাদেশের গ্রামগুলো এখনও ধুঁকছে দারিদ্র্য আর অনুন্নয়নের আগ্রাসী আক্রমণে। অনেক পরিসংখ্যান দেয়া হয়ে থাকে মাঝে মধ্যেই– সামষ্টিক ধরনের হিসাবে, কিন্তু সরেজমিনে কোথাও গেলেই হতাশ হতে হয়। স্বভাবতই দেখা যায়, দারিদ্র্যের সাথে গলাগলি করে আছে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। আধুনিক ধারণাপ্রসূত সঠিক মন্তব্যটি হচ্ছে– ডিজিটাল ডিভাইডের ভয়াবহ শিকার হতে চলেছে বাংলাদেশের মানুষ। নেটওয়ার্কের বাইরে থাকা বিপুলসংখ্যক অভাবী মানুষের কাছে উচ্চতর পর্যায় থেকে দেয়া স্লোগানগুলো কোনো অর্থবহন করে পৌঁছাচ্ছে না। শুধু শহরগুলোতেই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ অনলাইন পত্রিকা পড়ছে, নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে পা রাখলেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়। কোনো আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সহজে আইসিটি আসে না– যদিও বা আসে, তাও সেসব খুবই দুর্বল তথ্যসমৃদ্ধ।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ দেশের সাধারণ মানুষের আয়-উন্নতির তুলনায় আইসিটি ব্যবহার এখনও ব্যয়বহুল। কমপিউটার অথবা অন্য ডিভাইসের দাম কমছে না। নেটওয়ার্কও সবার ব্যবহারের জন্য স্বাভাবিক মূল্যমানের হয়ে ওঠেনি। ফলে পারিবারিকভাবে এর ব্যবহার বিলাসিতার পর্যায়েই রয়ে গেছে। শহরাঞ্চলের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরাও অনলাইনে খুবই কম থাকেন। বেশিরভাগই সাধারণ সেলফোনের মতোই ব্যবহার করেন আধুনিক ডিভাইসটিকে। গ্রামের মানুষ মোবাইল বা সেলফোন ব্যবহার করে শুধু কথা বলার জন্যই। মেসেজ টাইপ করার মতো সক্ষমতাও বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর নেই। দেশের মানুষকে নেটওয়ার্কের আওতার আনার লাগসই উদ্যোগ এখনও নেয়া হয়নি। সরকারের ডিজিটাল পদক্ষেপগুলোও বিপুল জনসাধারণের বেশিরভাগের অজানা। সম্প্রতি সরকারের একটি প্রকল্প এটুআই নিয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে বেশ আশাবাদী বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এর বিস্তৃতি কি আশানুরূপ ঘটেছে? এই এটুআইয়েরই আওতায় রয়েছে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র। কিন্তু যতটা উচ্চ আশাবাদের কথা ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে শোনা গিয়েছিল, ততটা বিস্তৃত হয়ে কিন্তু এখনও ওঠেনি। অতিসম্প্রতি একটি অনুষ্ঠান থেকে যে হিসাবটি পাওয়া গেছে, সেটা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। এটুআইয়ের দেয়া তথ্য মোতাবেক ৩১টি জেলার ১০১টি উপজেলার ২০০টি দুর্গম ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। ছয় বছরের এদিক-সেদিকে যে মাত্র ২০০টি ইউনিয়নে পৌঁছতে পেরেছে সরকার– এটাই মোদ্দা কথা। তাও এর অর্থায়ন হচ্ছে সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের আওতায়। এরপরও ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র এত কম ইউনিয়ন পর্যন্ত পৌঁছাল কেনো সেটাই প্রশ্ন। এ প্রকল্পে সরকারের পজিটিভ দিক হচ্ছে– এই মডেলটি গ্রহণ করেছে ভুটান, মালদ্বীপ ও নেপাল। ভয় হয় এর পরিণতি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডেলের মতো না হয়।

গত মে মাসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল আইসিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বাংলাদেশের অবস্থান আগের বছরের ১১৯ থেকে পাঁচ ধাপ নিচে নেমে ১২৪-এ দাঁড়িয়েছে। বিষয়টা হতাশার। কেননা, এত স্লোগান, এত যোগ্য উপদেষ্টা, এত অর্থায়ন এবং এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই অবনমন মানার মতো নয়। দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের ভূমিকা মাত্র ২.৭। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে মাত্র ৩.২। অবকাঠামোর ডিজিটাল কনটেন্ট ক্ষেত্রে মাত্র ২.৯। অথচ সক্ষমতা আছে ৬.৩ মাত্রার।

বিষয়গুলো অনুধাবন করা খুব একটা কঠিন নয়। কেননা, অন্য অনেক দেশেরই সক্ষমতা এই মাত্রার নয়। অথচ নেপাল ছাড়া আশপাশে থাকা আমাদের প্রতিবেশীরা ঈর্ষণীয় মাত্রায় এগিয়ে রয়েছে সার্বিক রেটিংয়ে, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে। অবকাঠামোর বিস্তৃতিও ঘটেছে অভাবিত মাত্রায়। অথচ ১৫ বছর আগের সম্ভাবনার জায়গাটাতেই আমরা থমকে আছি।

প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কেন হলো। কিছু করে ফেলায় জন্য কিংবা করার জন্য স্লোগান উদ্ভাবনের সন্তুষ্টির জন্যই কি গাছাড়া ভাব এসে গেল? আমরা দেখেছি দেরিতে এলো সাবমেরিন ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগ। সেটা আসার পর যা যা করা প্রয়োজন ছিল, তা করার হলো না। যে ব্যবসায়গুলো সে সময় আসতে পারত, সেগুলো আনতে পারলেন না প্রথাগত ব্যবসায়ীরা। নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য না হলো ভালো মানের ইনকিউবেটর, আর আইসিটি পার্ক তো হলোই না। নতুন পণ্য নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা গড়ে তোলার কথাও থেকে গেল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এগুলোকে উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার বলে ধরে নিলে নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ের যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলো বাস্তবায়ন হলে ডিজিটাল ডিভাইডের আশঙ্কাটা এখন যেমন আছে, তেমন মাত্রায় থাকত না। এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে পরিবেশ তৈরি করা। এই সময়ে বাংলাদেশকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, তার প্রথম এবং প্রধান বিষয়ই হচ্ছে পরিবেশ– যা সৃষ্টি করার দায়িত্ব সবসময়ই সরকারের। নিভৃত পল্লী পর্যন্ত সরকারি সেবা এবং কাজগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিবর্তিত করবে তো সরকারই। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত না হোক, সরকারি অনেক দফতরই উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গাতেই সুরম্য ভবন আছে, কিন্তু নেই ডিজিটাল অবকাঠামো। এসব জায়গায় কোনো কোনো অফিসে কমপিউটারের দেখা মেলে, কিন্তু তা নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত নয়– অফলাইনের। এগুলোকে আসলে টাইপরাইটারের জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। খুব বেশি প্রত্যন্ত নয় এমন অঞ্চলেও নেটওয়ার্কের মধ্যে নেই যন্ত্রগুলো। বিকল্প পন্থায় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে চাইলেও মধ্যম ও নিম্নতর স্তরের কর্মকর্তারা হার্ড কপি ছাড়া অন্য কিছুকেই আমলে নেন না। অনেক অফিসের তরুণ অফিসারেরা হেড অফিস থেকে অফিস অর্ডার বা চলমান কার্যক্রম নিজেদের ওয়েবসাইট খুলে আপলোড করলেও জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কোনো অফিসই তা ব্যবহার করে না।

আজকাল ভালো অফিস আছে থানাগুলোয়। এ ছাড়া জেলা কৃষি, মৎস্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পল্লী উন্নয়ন, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পেরও তা রয়েছে। কিন্তু সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ৯৯ শতাংশ অফিসই নেটওয়ার্কের মধ্যে নেই। এটা খুবই বিরক্তিকর এবং বিস্ময়কর যে, আর্থিক লেনদেন করে যে প্রকল্পগুলো অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঋণ বা স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পগুলো নেটওয়ার্কের আওতায় নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাজগুলো সবই হচ্ছে অফলাইনে এবং স্বভাবতই তা হয়ে পড়ছে দীর্ঘসূত্রী। উপজেলা এবং আরও তৃণমূল পর্যায়ে যেসব কর্মকর্তা আছেন তারা অনেক সময়ই অনুভব করেন না যে, একটা হেড অফিস আছে তাদের কিংবা জেলা অফিস আছে। শুধু বদলি, চাকরির সমস্যা নিয়েই এরা কথা বলেন ওইসব অফিসের সাথে, কিন্তু মূল দায়িত্ব পালন করেন খুবই ধীর গতিতে এবং কোনো ধরনের দায়বদ্ধতা ছাড়া। অথচ অনলাইনে যুক্ত থাকলে এবং অন্তত প্রতিদিন কাজের অগ্রগতি হালনাগাদ করার দায়িত্ব থাকলে এই শৈথিল্য থাকত না। ক্ষুদ্রঋণ বা পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বকর্মসংস্থান প্রকল্পগুলোর রিকভারি রেট এত বাজে থাকত না কিংবা খারাপ ঋণের পরিমাণও এমন বেড়ে যেত না। পল্লী উন্নয়নের অনেক উচ্চাভিলাষী প্রকল্পই কিন্তু প্রায় সব উপজেলা পর্যন্ত রয়েছে। আছে জনবলও, কিন্তু তারা দক্ষ নয়। আইসিটি তাদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করত। অফিসগুলোতে কমপিউটার ব্যবহারের জন্য একজন করে অপারেটরও পাবেন, কিন্তু এরা শুধু চিঠি টাইপ করেন। কোনো কর্মকর্তা, অ্যাকাউন্ট্যান্ট কিংবা অফিস সহকারী কখনও কমপিউটার ছুঁয়েও দেখেন না। প্রকল্প সম্পর্কিত কোনো নতুন তথ্য বা নির্দেশনা আপলোড করা হলেও তা এরা দেখতে নারাজ, কেউ তাগাদা দিলে এরা পুরনো ধাঁচের হার্ড কপি চেয়ে বসেন। অর্থাৎ আমলারাই বিষয়টাকে মূল্যহীন মনে করেন। নিজেরাও চেষ্টা করেন না হার্ড কপি বের করে নিতে।

এর ফলে যা হচ্ছে তা হলো– সমস্যাগুলো ক্রমাগত জটিল থেকে জটিল পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। পল্লীর মানুষকে সরকার যেসব সেবা দিতে দায়বদ্ধ এবং উদ্যোগও নিয়েছে, সেগুলো ব্যাহত হচ্ছে। এই যুগে ডিজিটাল কনটেন্ট নিয়ে কাজ করতে না পারলে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ উপকৃত হবে না। অথচ এই বিষয়েই এ দেশের পারফরম্যান্স সবচেয়ে খারাপ। এটুআই প্রকল্প যে কনটেন্ট নিয়ে কাজ করছে এবং যে ধরনের অবকাঠামো ব্যবহার করতে যাচ্ছে, তা স্বল্প-ঘনত্বের জনসংখ্যার জন্য কার্যকর। কিন্তু এত বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে আইসিটির আওতায় আনতে হলে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকেই আইসিটির সাথে যুক্ত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে দ্রুতগতিতে তথ্যের চলাচল। এখনও সবকিছু একমুখী হয়ে আছে বলেই পল্লী উন্নয়নে অবদান নেই আইসিটির। চলমান প্রক্রিয়ায় আসলে হচ্ছে না তেমন কিছুই কজ

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com